The best academic institute of our civilization – the Nalanda University glorified more than 1000 years from the ancient Gupta Dynasty up to Turk invasion at the time of Sen Dynasty in Gaur. Recently UNESCO honoured its ruin as International Heritage.

নালন্দায় রাজারা ছড়ি ঘোরাতেন না

গৌতম চক্রবর্তী

বসুবন্ধু, নাগার্জুন, শীলভদ্রদের শুধুই ছাত্র পড়াতে হলে নালন্দা অন্ধকারে হারিয়ে যেত। সিলেবাস শেষ করা নয়, তত্ত্বচর্চাই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল উদ্ধার।

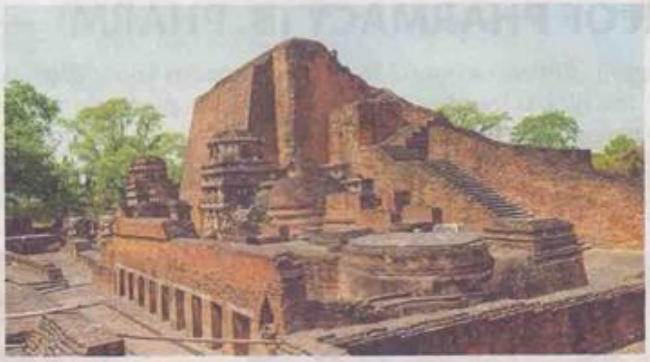

আসছেন সেই চৈনিক ছাত্র। কাড়ানাকাড়া বাজিয়ে ভিক্ষুরা নিয়ে আসছেন তাঁকে। কেউ তাঁর মাথায় ছাতা ধরেছেন, কেউ বা শিঙা বাজাচ্ছেন। রাস্তার দু'ধারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ফুল ছুড়ছেন মানুষজন। যে ছাত্র দরজা পেরিয়ে সবচেয়ে বেশি কৃতিত্বের সঙ্গে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে পারেন, তাঁকে প্রথম দিন এই ভাবেই অভ্যর্থনা জানানো হয়।

দরজা পেরনো মানে সাংঘাতিক এক এন্ট্রান্স টেস্ট। সেখানে দ্বারপাল হিসেবে হাজির থাকেন ডাকসাইটে এক পণ্ডিত। তিনি বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে জটিল, খুঁটিনাটি প্রশ্ন করবেন। সন্তোষজনক উত্তর পেলে তবেই সেই ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নেওয়া হবে। হিসাব, দশ জনের মধ্যে আট জন ছাত্রই সেই পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়।

কাড়ানাকাড়া বাজিয়ে যে চৈনিক শ্রমণটিকে নিয়ে আসা হচ্ছে, তাঁর নাম হিউয়েন সাং, চিনা ভাষায় শুয়ান্‌ৎসাং। গত কয়েক বছরে কোনও শিক্ষার্থীই দ্বারপালের প্রশ্নের এত সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি। চৈনিক ছাত্রটি পালি ভাষায় মূল ত্রিপিটক আউড়ে দিয়েছেন, জানিয়েছেন বিভিন্ন দার্শনিকের মত অনুযায়ী শ্লোকের বিভিন্ন ব্যাখ্যা। যে ভাষাটি জানতেনই না, সেই সংস্কৃতে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের সূত্রও তাঁর নখদর্পণে। নালন্দায় আসার আগে চিন থেকে প্রথমে কাশ্মীর পৌঁছেছিলেন এই শিক্ষার্থী। সেখানে বৌদ্ধ দার্শনিক সংঘাসাসের কাছে দু'বছর মাথা মুড়িয়ে অধ্যয়ন। সংঘাস্যাসই তাঁকে ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্র ও পাণিনি পড়ান। জানান, ভারতীয় দর্শন অন্য রকম। মহাযান বৌদ্ধধর্মের কথা বলতে চাইলে, আগে বিরোধী হীনযান গ্রন্থ পড়তে হবে। পূর্বপক্ষের যুক্তি না জানলে জবাব দেবে কী ভাবে? নালন্দা এ রকম ছাত্রই চায়।

চিন, জাপান, সুমাত্রা থেকেও মেধাবী ছাত্ররা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন দেখেন। সবাই হিউয়েন সাং নয়। দিনের পর দিন দেশদেশান্তর থেকে আসা মেধাবীরা নালন্দার দ্বার থেকে মাথা হেঁট করে বিদায় নিচ্ছেন, পরের বার ফের নতুন প্রস্তুতি নিয়ে পূর্ণ উদ্যমে হাজির হচ্ছেন, এ দৃশ্য নালন্দা মহাবিহারে অতিপরিচিত। এখানে শিকে ছিঁড়তে পারে শুধু মেধায়। ই চিং নামে এখানকার এক চিনা ছাত্র লিখে গিয়েছেন, দ্বারপালের পরীক্ষায় পাশ করতে না পারলে রাজপরিবার থেকে আসা প্রার্থীদেরও ফিরে যেতে হয়।

অথচ রাজারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ চালান। এখানে পড়তে মাইনে লাগে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ সংস্থানের জন্য ২০০টি গ্রামের রাজস্ব নির্দিষ্ট করা আছে। সেই সব গ্রাম থেকে প্রতিটি ছাত্রের জন্য প্রতিদিন লেবু, আখরোট, পেস্তাবাদাম, কর্পূর, মাখন, দুধ, ঘি এবং সুগন্ধি মহাশালী চাল বরাদ্দ।

এর আগে গান্ধার রাজ্যে পুষ্কলাবতী (পেশোয়ার)-এর কাছে তক্ষশীলা নামেও খ্যাতনামা এক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। সেখানকার ছাত্র ছিলেন সম্রাট অশোক। সেই তক্ষশীলা থেকে পড়ে আসা পাণিনি ব্যাকরণ লিখে সংস্কৃত ভাষার নতুন মেরুদণ্ড দান করেছেন, কৌটিল্য রচনা করেছেন অর্থশাস্ত্র।

কিন্তু তক্ষশীলা অনেকটা প্রাচীন গুরুগৃহের বর্ধিত সংস্করণ। সেখানে গুরুকে মেধা দিয়ে তুষ্ট করতে পারলে তাঁর আবাসে থেকে নিখরচায় পড়াশোনা। দ্বারপালের পরীক্ষা সেখানে ছিল না। তা ছাড়া, তক্ষশীলার অনেক গুরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু নালন্দা মহাবিহারের এক হাজার অধ্যাপকের প্রত্যেকেই কোনও না কোনও বিহার বা 'কলেজ'-এর সঙ্গে সংযুক্ত। পৃথিবীতে প্রথম যদি ঠিকঠাক কোনও বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে থাকে, এই নালন্দা। প্রসঙ্গত, তক্ষশীলায় ভর্তির ন্যূনতম বয়স ছিল ১৬। নালন্দায় ২০।

তক্ষশীলার সঙ্গে তাও রাজাদের সূক্ষ্ম একটা সম্পর্ক ছিল। শিক্ষার পর কোনও গরিব ছাত্র প্রার্থিত গুরুদক্ষিণা দিতে না পারলে রাজা তাকে অর্থ সাহায্য করতেন। কিন্তু নালন্দা সেটুকু যোগও রাখেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্বতা ও স্বাধিকারই সেখানে আসল। মেধায় না পারলে রাজপরিবারের ছাত্রও ফিরে যাবে, কিন্তু চিন থেকে আসা ছাত্রকেও কাড়ানাকাড়া বাজিয়ে সসম্মানে ভর্তি করে নেওয়া হবে।

রাজারাও মেনে নিয়েছিলেন সেই স্বাধিকার। মহাবিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গুপ্তরাজ শক্রাদিত্য বা প্রথম কুমারগুপ্ত। তাঁর উত্তরসূরি বুদ্ধগুপ্ত, তথাগতগুপ্ত, বালাদিত্যরাও একশো বছর ধরে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য তৈরি এই মহাবিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়টিকে আয়তনে বাড়িয়ে যান। এই গুপ্ত রাজারা সকলেই হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী, প্রতিষ্ঠাতা প্রথম কুমারগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞও করেছিলেন।

হিন্দু রাজা কেন বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করবেন? তার জন্য দুই শতাধিক গ্রামের রাজস্বও দান করবেন? ইতিহাসবিদরা একবাক্যে জানাচ্ছেন, শিক্ষার ব্যাপারে তখন 'আমরা-ওরা' ছিল না। গুপ্তরাজ বজ্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত করেন মধ্য ভারতের আর এক রাজা যশোধর্মদেব। কিন্তু যুদ্ধে জিতে তিনি গুপ্তদের তৈরি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীর ও ফটক তৈরি করে দিলেন!

রাজার সঙ্গে নালন্দার পণ্ডিতদের সম্পর্ক কী রকম? বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকেরা স্বাধীনচেতা। পৃষ্ঠপোষক নৃপতিদেরও জান দিতে ছাড়েন না। নালন্দার বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন সাতবাহন রাজাকে চিঠিতে জানাচ্ছেন, 'রাজত্ব, বিত্ত, সবই ক্ষণস্থায়ী। বরং আসক্তি, ক্লান্তি, কামনাবাসনা, মিথ্যা গর্ব, এরাই হোক আপনার শত্রু। প্রতি মুহূর্তে এদের জয় করার চেষ্টা চালাবেন।' বাঙালি ছাত্ররাও কম যায়নি। নালন্দার ছাত্র ও শিক্ষক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ পরে পাল রাজাদের বিক্রমশীলা মহাবিহারের আচার্য। তিনি পালরাজ ন্যায়পালকে চিঠি লিখছেন, 'সিংহাসনে বসেও শূন্যতার চিন্তা পরিহার করবেন না। সবই ক্ষণস্থায়ী। ঔদ্ধত্য নয়, অতিরিক্ত কথা বলা নয়, বরং জিহ্বাকে শাসনে রাখাই রাজার কর্তব্য।'

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে লিখিত পরীক্ষা, শংসাপত্র ইত্যাদির বালাই নেই। বিতর্কে যদি শিক্ষকদের মুগ্ধ করতে পারেন, তখনই পরের স্তরে যাওয়ার অনুমতি। ছাত্ররা প্রায় সাত-আট বছর ধরে এ ভাবেই এখানে অধ্যয়ন করেন। ধরা যাক, কোনও শিক্ষক বা আচার্য নতুন কোনও নিয়মের কথা বলতে চান! নিয়ম— বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অফিসার ঘণ্টা বাজিয়ে মঠ ও ছাত্রাবাসে প্রতিটি ছাত্রকে নমস্কার করে নির্দিষ্ট জায়গায় আসতে বলবেন। নতুন নিয়মের কথা বলা হবে। যদি এক জনও যুক্তিগ্রাহ্য তর্কে সেই নিয়মের বিরোধিতা করেন, নিয়ম গ্রাহ্য হবে না। সবাই বিনা প্রশ্নে মেনে নিলে তখনই নতুন নিয়ম।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয় বৌদ্ধ শাস্ত্র, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, বেদ, সাংখ্যদর্শন। পড়ানো হয় সাহিত্যও। সারা মহাবিহার জুড়ে সেই সব বিষয়ে হরেক 'স্কুল অব স্টাডিজ'। রয়েছে ১০০টি প্রস্তরমঞ্চ। সেখানে শিক্ষকেরা উপদেশ দেন, বিভিন্ন হলে তাঁদের ঘিরে বসে থাকেন প্রায় ৩ হাজার ছাত্র। মানে প্রতি ক্লাসে গড়পড়তা ৩০ জন।

ছিল তিনটি পাঠাগার রত্নোদধি, রত্নসাগর ও রত্নমঞ্জরী। ছাত্রাবাসে প্রায় ৩০০ অ্যাপার্টমেন্ট। ধ্বংসাবশেষে এখনও দেখা যায়, কোনও কোনও ঘরে দু'টি পাথরের খাট। দু'জনের থাকার বন্দোবস্ত। মাঝে একটি পাথরের খাঁজ। সেখানে অধ্যয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁথি রাখা থাকত। সময় শাসন করত জলঘড়ি। জলভরা একটা বড় তামার গামলায় ছোট এক তামার বাটি। ভোরবেলা ছোট বাটি একটু ডুবলে শঙ্খধ্বনি ও ঢাকের আওয়াজ। মানে, রাইজিং বেল। সূর্যাস্তের পর আর ঢাক, কাঁসরঘণ্টা নয়। দুপুরে জলাশয়ে স্নান ও খাওয়া সেরে ফের ক্লাসঘরে। 'প্রশ্ন করা ও বিভিন্ন বিষয় জানার পক্ষে দিনটা ছোট মনে হত। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি বিভিন্ন বিদ্যার চর্চা চলত,' লিখছেন হিউয়েন সাঙ।

দিনটা ছোট মনে হত, কারণ নালন্দা শুধু শিক্ষকতা করত না। বৌদ্ধ শাস্ত্রে গবেষণা তার উজ্জ্বল উদ্ধার। আগে বৌদ্ধ শাস্ত্র মানে শুধুই ত্রিপিটক ও বুদ্ধবচন। কিন্তু বুদ্ধের বাচনের কি একটিই অর্থ? যার যার মেধা অনুসারে অর্থও তো অন্য রকম হতে পারে। গৌতম বুদ্ধের বচন কি শুধুই নিজের মুক্তির জন্য? এই সব ভিক্ষু গবেষক ও অধ্যাপকদের দৌলতে নালন্দায় পূর্ণ ভাবে বিকশিত হয়ে উঠল মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম। আজ চিন, জাপান, কোরিয়ায় বিভিন্ন রূপে যে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম, তা নালন্দার উত্তরাধিকার।

হিউয়েন সাঙ চিন থেকে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিখতে এসছেন যোগাচার। মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের এই শাখা বলে, শুধু মনই সত্য। বাকিটা বিভ্রম। নালন্দার দার্শনিক নাগার্জুন আবার মাধ্যমিক মতের প্রবক্তা। তাঁর মতে, মনও বিভ্রম। এখানকার শিক্ষক ভাব্য প্রথমে কপিলের সাংখ্যদর্শনের গুণগ্রাহী ছিলেন। পরে হয়ে উঠলেন নাগার্জুনের মাধ্যমিক দর্শনের অন্যতম পণ্ডিত। সব মত সযত্নে লালন করেছে নালন্দা।

সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসস্তূপই সম্প্রতি উঠে এল ইউনেস্কোর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তালিকায়। টাকা দিলেই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজন্যবর্গের মাতব্বরির অধিকার আসে না, শিখিয়েছিল নালন্দা। গবেষণা নয়, আট ঘণ্টা ক্লাস নেওয়াই আসল— এমন উদ্ভট চিন্তা থাকলে নালন্দা কখনওই নালন্দা হত না। বসুবন্ধু, নাগার্জুন, শীলভদ্র, ধর্মকীর্তিদের শুধুই ছাত্র পড়াতে হলে নালন্দা অনেক আগেই অন্ধকারে হারিয়ে যেত। রোজকার সিলেবাস শেষ করা নয়, তত্ত্বচর্চাই যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল উদ্ধার তার প্রমাণ ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ ভিনসেন্ট স্মিথের উক্তি: নালন্দার ইতিহাস আসলে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের অগ্রগতির ইতিহাস। ভারতের সাম্প্রতিক রাজন্যবর্গ উচ্চশিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে এই কথাগুলি মাথায় রাখলেই মঙ্গল।

দিনের পর দিন দেশদেশান্তর থেকে আসা মেধাবীরা নালন্দার দ্বার থেকে মাথা হেঁট করে বিদায় নিচ্ছেন, পরের বার ফের নতুন প্রস্তুতি নিয়ে পূর্ণ উদ্যমে হাজির হচ্ছেন।